ভূমিকা

সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ, মানব জীবনের প্রতিফলক। মানব জীবনের কথা কবিরা সুপ্রাচীন কাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কখনো দেবতার অন্তরালে কখনো রূপকের আড়ালে আবার কখনো ব্যক্তির স্বমহিমাকে স্বর্ণাক্ষরে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ। এই চর্যাপদের কবিতাবলী আনুমানিক দশম-দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত হয়েছে। চর্যাপদের পদগুলির মধ্য দিয়ে তৎকালীন বাংলার সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে, যদিও এই পদগুলির মূল লক্ষ্য ছিল সিদ্ধাচার্যদের সাধনচর্যা তবুও তাঁরা বাংলার সমাজচিত্রকে তাঁদের ভাব প্রকাশের যোগসূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ সাধক সম্প্রদায়ের সাধনার ইঙ্গিত লুকানো থাকলেও তাঁরা বাংলার সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীভূদেব চৌধুরী তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন— ''কেবল ভাষার দিক থেকেই নয়, ভাবের বিচারেও 'চর্যা' পদাবলি বাংলার লোকজীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সূত্রে বাঁধা।''[১] দ্বাদশ শতাব্দীর পরে দীর্ঘ দেড়শ বছরের বেশী সময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চলছিল সম্পূর্ণ এক শূন্যতাময় যুগ। এসময় কোন লিখিত সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া যায় না বলে এই সময়কে বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলা হয়ে থাকে। এই সময় বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় জীবনে এক সংকটময় পরিস্থিতি তৈরী হয়েছিল, এর মূলে ছিল বহিরাগত তুর্কি আক্রমণ। মুসলমান বিজয়ের ফলে রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তন ঘটে। তুর্কি বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার গ্রাম জীবনের পরিবর্তনের সাড়া জাগেনি। কিন্তু পুরাতন সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলি ধ্বংস হয়েছে, ফলে বুদ্ধিজীবী বাঙালী বিমূঢ় হয়ে পড়েছে। দীর্ঘকাল কোন নূতন সংস্কৃতি কেন্দ্রের খোঁজ মেলেনি। এই সময় শাসকরা মুসলিম হওয়ার কারণে হিন্দুদের উপর অত্যাচার চালায়— এ প্রসঙ্গে ক্ষেত্রগুপ্ত তাঁর 'বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— ''হিন্দু ধর্মের উপরে প্রত্যক্ষ অত্যাচার, ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার, শাসকশক্তির সহযোগিতা, বৌদ্ধ ধর্মীয় নেতৃত্বের বিলোপ শাসকের ধর্মগ্রহণের বাস্তব জাগতিক সুবিধা বাংলার সমাজ-জীবনে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করল।''[২] এর ফলে উচ্চস্তরের হিন্দু ও নিম্ন স্তরের হিন্দুদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার প্রবণতা দেখা যায় নিজেদের রক্ষা করার জন্য, যার ফল স্বরূপ আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয় দেখা যায়। সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— ''মুসলমান শাসনের গোড়ার দিকে সমাজে— এখন হইতে হিন্দু-সমাজ বলা উচিত— ঝাঁকুনির ফলে উঁচুনীচু সমান হইবার সুযোগ মিলিল। মহাযান উপাস্য অনেক দেবদেবী ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে স্থান পাইল এবং লোপোন্মুখ (তান্ত্রিক)

বৌদ্ধমত ব্রাহ্মণ্য মতের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। শাস্ত্রীয় দেবদেবীর নাম ও প্রকৃতি গ্রামদেবদেবী যথাসম্ভব গ্রহণ করিতে লাগিল।"[৩] অন্ধকার পর্বের প্রায় দুশো বছর ধরে বাঙালী এই সমন্বয় লাভ করেছে, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের পটভূমিকা তৈরী করেছে। সৃজনধর্মের দিক থেকে নিষ্ফলা এই দুশো বৎসর পরবর্তী চারশ বছরের সাহিত্য সৃষ্টির বীজ বপন করেছে। অর্থাৎ তুর্কি আক্রমণের ফল স্বরূপ বাংলা সাহিত্যে সৃষ্টি হয় মঙ্গলকাব্যের। শ্রীভূদেব চৌধুরী উল্লেখ করেছেন— ''আলোচ্য যুগের অভিজাত হিন্দুরা নিজেদের সাহিত্য, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-সম্পদকে বাঙালি সাধারণের মনের কাছে পৌঁছে দিয়েই থামেনি। অপর পক্ষের ধর্ম এবং পূজাচারকে নিজেদের উন্নত রুচি-কল্পনার দ্বারা পরিশোধিত করে হিন্দু সংস্কৃতির অঙ্গীভূত করে নিয়েছিলেন। এই চেষ্টার ফলেই বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যের পরিণত রূপ সুগঠিত হয়ে ওঠে। সর্প-দেবতা মনসা, এবং পশু-দেবতা মঙ্গলচণ্ডী আর ধর্মঠাকুর, মূলত এঁরা অন্ত্যজ শ্রেণীর লোকেদের দ্বারাই পূজিত হয়েছিলেন। এবার এঁদের নিয়েও সংস্কৃত ভাষায় ধ্যান-মন্ত্র রচিত হতে লাগল।— পুরাণে মনসা শিবের কন্যা এবং মঙ্গলচণ্ডী শিবের পত্নী রূপে স্বীকৃতি পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এঁদের মঙ্গলকারী শক্তির মহিমাগান করে রচিত হতে লাগল বাংলা মঙ্গলকাব্য।"[৪]

ভারতীয় যে সকল প্রাগ্-বৈদিক দেবতা পরবর্তী হিন্দু সমাজেও নিজেদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে শিবই সর্বপ্রধান। ভারতীয় পৌরাণিক সমাজ রুদ্র, শিব ও যোগী চরিত্রের মধ্যে কোনপ্রকার সামঞ্জস্য স্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছেন। সেই জন্য একদিকে এই দেবতা যেমন ঘোর ভৈরব এবং রুদ্র আবার তেমনই অন্যদিকে অঘোর, শিব এবং দক্ষিণ আবার তিনিই যোগীশ্বর ও যোগীন্দ্র। পৌরাণিক সাহিত্যের ভিতর দিয়েই প্রধানত আর্যধর্ম বাংলাদেশে প্রচারিত হয়েছিল বলে এই দেবতার চরিত্রগত বিভিন্নমুখী এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রথম থেকেই এই দেশে প্রচার লাভ করেছিল, সেই জন্য তিনি কোথাও মঙ্গলকারী দেবতা আবার কোথাও রুদ্র ভয়ানক। শিবের এই দুইটি প্রধান চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের উপরই বাংলার লৌকিক শৈবধর্ম স্থাপিত হয়েছে।

বহিরাগত শৈবধর্ম বাংলায় সমাজের উচ্চস্তরেই সর্ব প্রথম প্রচারিত হয়েছিল এবং কালক্রমে ধীরে ধীরে নিম্নতর সমাজে প্রসার লাভ করে ও নিম্নতর সমাজের মধ্যে প্রচারিত হয়ে এই শৈবধর্ম তার পৌরাণিক আদর্শ বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়। নিম্নতর সমাজ নিজস্ব সংস্কারের ভিত্তির উপর উচ্চতর সমাজ থেকে সর্বদা তার সব বিষয়ে প্রেরণা লাভ করে থাকে, কিন্তু প্রকৃত মানসিক শিক্ষার অভাবে যে সব উপকরণ উচ্চতর সমাজ থেকে তাতে গৃহীত হয়, তার মধ্যে তাদের যথাযথ প্রয়োগ সম্ভব হতে পারে না— নিম্নতর সমাজের সংস্কার অনুযায়ী তারা নতুন রূপে পুনর্গঠিত হয়। অনেক

সময় তা এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে থাকে যে, তাদের মৌলিক পরিচয় উদ্ধার করা কঠিন হয়ে পড়ে। পৌরাণিক শৈব ধর্ম যখন উচ্চতর হিন্দু সমাজ থেকে ক্রমে নিম্নতর সমাজের মধ্যে প্রচার লাভ করে তখন তা নতুন রূপ লাভ করে এবং এই রূপ বাংলাদেশের সর্বত্র যে অভিন্ন থাকল না কারণ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় অবস্থার উপর ভিত্তি করেই এই নতুন পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছিল। ক্রমে মূল পৌরাণিক আদর্শ থেকে এই সকল স্থানীয় পরিকল্পনা অত্যন্ত দূরবর্তী হয়ে পড়েছিল।

পৌরাণিক অকিঞ্চন শিবের-পরিকল্পনার উপরই ভিক্ষুক, কৃষক শিবের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। কৃষিকার্য ব্যতীত বাংলাদেশের শিব চরিত্রের উপর আরও কয়েকটি গুণ আরোপ করা হয়েছিল, তা হল তাঁর ভাঙ্ ও গাজায় আসক্তি। শিব কর্তৃক বিষপানের পৌরাণিক কাহিনীকেই সেকালের বাঙালী কৃষকগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা ও রুচি অনুযায়ী এইভাবে রূপান্তরিত করে নিয়েছিল। এইভাবে দেখতে পাওয়া যায় যে, বাংলার শিব একদিকে একজন অলস কৃষক, আবার অন্যদিকে গাঁজা এবং ভাঙে পরম আসক্ত ও অন্য নারীর প্রতি আসক্ত। শিবের রূপ-বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর 'হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

''রুদ্র-শিবের উপাসনা বহুব্যাপকতা লাভ করায় আর্যেতর বিভিন্ন জাতির মধ্যে এই দেবতাটি নিজের প্রতিষ্ঠা কায়েম করে নিয়েছিলেন। যজুর্বেদের যুগ থেকেই আর্য-শিব অন্ত্যজ শ্রেণীর পূজা লাভ করেছেন। তারপর সহস্রাধিক অথবা কয়েক সহস্র বৎসর ব্যাপী শিব নানা শ্রেণীর নানা জাতির উপাস্য হয়ে বিচিত্র বিরুদ্ধ গুণে ভূষিত হয়েছেন। সর্বত্যাগী মহাযোগী শিব যুগে যুগে কত ভাবেই না চিত্রিত হয়েছেন ধর্মগ্রন্থে সাহিত্যে ! মহাভারতে পুরাণে শিব জগৎ রক্ষা করতে কালকূট বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়েছিলেন। এই বিষপানের কাহিনী থেকেই কি-না কে জানে শিব হলেন গাঁজাখোর, ভাংখোর,— ধুতুরাখোর, — গাঁজা-ভাঙ্ আর ধুতুরায় তার চোখ তিনটি ঢুলু ঢুলু। তাঁর হাতে শোভা পেল নর-কপাল, তিনি হলেন শ্মশানচারী, গলায় পরলেন হাড়ের মালা। হাতে পিণাকের পরিবর্তে সাপুড়ের ডমরু ও শিঙ্গা। তিনি স্মরহর যোগিরাজ হয়েও কামুক লম্পট। মহাভারতে তিনিই কীরাতরূপে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। সামান্য স্তবে অথবা বিল্বপত্রে তুষ্ট হয়ে আশুতোষ অসুরদের বর দিয়ে দেবতাদের বিপর্যয় ডেকে এনেছে, আবার সময়ে সময়ে দানববধেও মেতে উঠেছেন। আবার কখনও তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে ভিক্ষা করছেন দ্বারে দ্বারে। বাঙলাদেশে তিনি আবার কৃষিকর্মও করেছেন। এইভাবে বহুতর বিরুদ্ধ গুণের সংস্পর্শে আর্য ও আর্যেতর বিভিন্ন সংস্কৃতির মহামিলনের পরম তীর্থরূপে সার্বজনীন ভক্তি ও শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছেন

দেবাদিদেব মহাদেব।”[৫]

গুরুদাস ভট্টাচার্য তাঁর ‘বাংলা কাব্যে শিব’ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— ‘‘ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে এই একটানা ইতিহাস— কখনও সমতল, কখনও অসমতল, কখনও-বা একসঙ্গে দুইই: সংঘর্ষ ও শান্তি, স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, মেঘ ও রৌদ্র পাশাপাশি। তার প্রতিক্রিয়ায় বাঙালীর সংস্কৃতি-ভাবনায় দেখা দিয়েছে নিরন্তর জটিল আবর্তন, ধর্মগত কলহ ও সন্ধি, দেব-দেবীর বিরোধ ও মিলন— বৈষ্ণবে ও শাক্তে, চণ্ডী ও মনসায়, ধর্মঠাকুরে ও চণ্ডীঠাকুরাণীতে। শিব প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে বীতরাগ, পরবাদ ও পরিবাদে নিস্পৃহ; তথাপি যেহেতু তিনি আছেন সর্বধর্মে, সকল কাব্যে, তাই এই দোলাচল আবর্তে তাঁকেও আন্দোলিত হতে হয়েছে। যাঁর সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে, ‘সুমঙ্গল শিব মোহাশয়। বর দেন যেই জনে, সেই ত্রিভুবন জিনে, শিববরে থাকয়ে নির্ভয়ে’, তিনিই আবার ধর্মায়ণে ধর্মের অধীন, রামায়ণে রামের অধীন, মনসামঙ্গলে মনসার চণ্ডীমঙ্গলে চণ্ডীর, মহাভারতের কৃষ্ণের, বৈষ্ণব চরিতে চৈতন্যের, নাথসাহিত্যে গোরক্ষ-ময়নামতীর। একই কাব্যের এপিঠে বিরোধ, ওপিঠে মিলন একই লেখনীমুখে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিপরীত চিত্র-সমন্বয়ের এই কারুকার্যটি পুরাণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, বাঙালী কবি তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন; সমকাল তাকে দিয়েছে উদ্দীপনা, কবিমানস দান করেছে শিল্পরূপ।”[৬]

এইভাবে পৌরাণিক শিব কাহিনী এবং লৌকিক শিব কাহিনীর সংমিশ্রণে আমরা পেয়েছি শিবায়ন কাব্য। এই শ্রেণীর কাব্যের কবিগণ হলেন— রামকৃষ্ণ রায়, রামেশ্বর ভট্টাচার্য, শঙ্কর কবিচন্দ্র, দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজমণিরাম, বিনয় লক্ষণ, শেখচান্দ, দ্বিজরামচন্দ্র।

রামকৃষ্ণ রায় রচিত কাব্য সর্বপ্রথম সুসংবদ্ধ শিবমঙ্গল কাব্য, শিব-বিষয়ক কোন কাহিনী নিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ কোন শিবমঙ্গল কাব্য রচিত হয়নি। তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পৌরাণিক ও লৌকিক আখ্যান অবলম্বনে তাঁর ‘শিবায়ন’ কাব্য বা ‘শিবমঙ্গল’ কাব্যটি রচনা করেন। শিবমঙ্গল কাব্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ‘শিব-সংকীর্তন’ কাব্যটি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই কাব্যটি রচনা করেন। ‘কবিচন্দ্র রামকৃষ্ণ রায় ও রামেশ্বর ভট্টাচার্যের ‘শিবমঙ্গল’ কাব্যের কাহিনী গ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রণে প্রথানুগত্য ও প্রথামুক্তি: একটি তুলনামূলক আলোচনা’ আমার অভিসন্দর্ভের মূল বিষয়। উভয় কাব্যের কাহিনীগ্রন্থন, চরিত্র চিত্রণ, কাহিনীগ্রন্থন ও চরিত্র চিত্রণে অভিনবত্ব— প্রভৃতি দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ রেখে মূল আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

তথ্যসূত্র:

১. চৌধুরী, শ্রীভূদেব : বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ: অক্টোবর ১৯৮২, কার্তিক ১৩৬১, পৃ. ৪

২. গুপ্ত, ক্ষেত্র : বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলি-৯, অষ্টাদশ সংস্করণ: আগস্ট, ২০১২, পৃ. ৪৯

৩. সেন, সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, প্রথম প্রকাশ, ১৯৪০, প্রথম আনন্দ সংস্করণ, ১ লা বৈশাখ, ১৩৯৮, অষ্টম মুদ্রণ, কার্তিক ১৪১৪, পৃ. ৮১

৪. চৌধুরী, শ্রীভূদেব : বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ: অক্টোবর ১৯৮২, কার্তিক ১৩৬১, পৃ. ১০

৫. ভট্টাচার্য, হংসানারায়ণ : হিন্দুদের দেবদেবী উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, দ্বিতীয় পর্ব, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭ বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ-১৯৮৪, পুনর্মুদ্রণ ২০২২, পৃ. ৫৩, ৫৪

৬. ভট্টাচার্য, গুরুদাস : বাংলা কাব্যে শিব, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড কোং প্রা:লি:, ৯৩, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, প্রথম সংস্করণ: ৭ই আশ্বিন, ১৮৮২, পৃ. ৯১